ATHENA, VOLUME IV, JULY 2020 C.E. (ISSN: 2454-1605) pp. 88-94
www.athenajournalcbm.in

জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলার নিম্নবর্গীয়দের ইতিহাস: প্রসঙ্গ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন (১৯২১-১৯৪৭)

পলাশ চন্দ্র মোদক*

প্রাপ্ত: ২০/০৫/২০২০ পরিমার্জন: ০৫/০৬/২০২০ গৃহীত: ২৫/০৬/২০২০

সারসংক্ষেপ: *আজ সারা পৃথিবী ব্যাপী 'Sub-altern History' অর্থাৎ তথাকথিত নিম্নবর্গীয়দের ইতিহাস রচনার যে প্রবণতা চলছে, তারই প্রভাব স্বরুপ উত্তরবঙ্গের নিম্নবর্গীয়দের ইতিহাস রচনার প্রয়াস। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে উত্তরবঙ্গের অগণিত নিম্নবর্গীয় মানুষেরা এগিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু সেই সব আত্মত্যাগী মানুষদের ত্যাগের ইতিহাস কেউ লিখে রাখেননি। এমনকি কোন সরকারি বা বেসরকারি নথিপত্রে সেই তথ্য নেই বললেই চলে। জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলায় এমন অনেক স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন, যাঁদের এক-দুই শতাংশও তাম্রপত্রধারী বা পেনশন প্রাপক নন। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় উত্তরবঙ্গে যে আলোড়নের শুরু হয়েছিল, সেখানে পুরুষদের পাশাপাশি মহিলারাও সমানভাবে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। স্বাধীনতা লাভের পূর্ব মুহুর্তে ডুয়ার্সের চা বাগানের আদিবাসী শ্রমিকদের মধ্যে অনেকেই ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোনলে অংশগ্রহণ করে শহীদ হয়েছিলেন। এভাবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার জনগণ দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়েছিলেন, কখনো পুলিশের মুখোমুখি হয়ে সংগ্রাম করেছিলেন, কখনোবা জেলে গিয়েছিলেন দেশ মায়ের জন্য।*

সূচক শব্দ: *উত্তরবঙ্গ, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, নিম্নবর্গ, ডুয়ার্স, আদিবাসী, স্বাধীনতা সংগ্রাম।*

* পিএইচ.ডি. গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়, কোচবিহার।
e-mail: palashmodak84@gmail.com

স্বাধীনতা সংগ্রাম হল ভারতের জাতীয় জীবনের একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। ইংরেজদের শাসনবন্ধন ছিন্ন করে নিজেদের দেশকে মুক্ত করে স্বপ্রতিষ্ঠিত হবার বাসনায় ভারতবর্ষের সর্ব শ্রেণীর লোক উদ্বেল হয়ে উঠেছিলেন। অন্যান্য শ্রেণীর মতো নিম্নবর্গীয় মানুষেরাও এই স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আজ সারা পৃথিবীব্যাপী 'Sub-altern History' অর্থাৎ তথাকথিত নিম্নবর্গীয়দের ইতিহাস রচনার যে প্রবণতা চলছে, তারই প্রভাব স্বরুপ উত্তরবঙ্গের অন্তর্গত জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলার নিম্নবর্গীয়দের এই ইতিহাস রচনার প্রয়াস। এই গবেষণামূলক নিবন্ধে সেই সব অনালোচিত নিম্নবর্গীয় ব্যক্তিবর্গের কথা বলা হয়েছে, যারা ভারতীয় ঐতিহ্য ও ইতিহাসকে এক বিশেষ মাত্রা প্রদান করেছেন তাঁদের নিজ কর্ম সম্পাদনের মধ্য দিয়ে। অথচ তাঁদেরকে ভারতীয় জাতীয় ইতিহাসের পাতায় কখনো স্থান দেওয়া হয়নি বা সেই বিষয়ে কোন প্রয়াসও করা হয়নি। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে উত্তরবঙ্গের অগণিত নিম্নবর্গীয় মানুষেরা যেভাবে এগিয়ে এসেছিলেন, তারই একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে আলোচ্য এই গবেষণামূলক নিবন্ধে।

বাংলা তথা ভারতবর্ষের নিম্নবর্গীয় ইতিহাস চর্চায় উত্তরবঙ্গের একটি বিশেষ স্থান রয়েছে। কখনই কেউ উপলব্ধি করতে পারেনি যে, স্বাধীনতা আন্দোলনে ভারতের গ্রাম গ্রামান্তরে অতি সাধারণ মানুষদের আত্মত্যাগের ইতিহাস কত উজ্জ্বল, কত গৌরবময় এবং কতটা গুরুত্বপূর্ণ। যদিও সেই ইতিহাসকে তুলে ধরার কাজটি খুবই কঠিন ও কষ্টকর, বিশেষ করে স্বাধীনতা সংগ্রামের এত বছর পরে। সেই সব আত্মত্যাগী মানুষদের ত্যাগের ইতিহাস কেউ লিখে রাখেননি। এমনকি কোন সরকারি বা বেসরকারি নথিপত্রে সেই তথ্য নেই বললেই চলে। তাঁদের পরিবারের কেউ যে সেই তথ্য দেবেন, তেমন কোন ব্যক্তির সন্ধান মেলাও কঠিন। অথচ সেই সকল মহান মানুষদের ত্যাগ ও স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁদের অবদানের কথা তুলে ধরতে না পারলে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এবিষয়ে যে সকল ব্যক্তিবর্গ (যেমন – শ্রীনির্মল চন্দ্র চৌধুরী, শ্রীউমেশ শর্মা)[১] উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন ক্ষেত্রকে কেন্দ্র করে তাঁদের লেখনী ধারণ করেছেন, তাঁদের সহায়তাতেই নিম্নবর্গীয় একটি প্রায় সামগ্রিক ইতিহাস তুলে ধরা সম্ভবপর হয়েছে। তাঁদের রচনা থেকে এমন বহু জীবিত ও প্রয়াত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নাম পাওয়া যায়, যাঁদেরকে তেমনভাবে কোনদিনই ইতিহাসের পাদপ্রদীপের সম্মুখে নিয়ে আসা হয়নি। এই মহান মানুষগুলির বিষয়ে সারা ভারত বা পশ্চিমবঙ্গ তো দূরের কথা, উত্তরবঙ্গের সাধারণ মানুষেরাও কোন দিন পরিচিত ছিল না। এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় সেই সকল অনালোচিত, অবহেলিত এবং জাতীয় স্তরে উপেক্ষিত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নাম উল্লেখ করা সম্ভব না হলেও তাঁদের প্রতি সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে কিছু স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নাম ও কার্যকলাপ উল্লেখ করা হল।

জলপাইগুড়ি জেলার গ্রামীণ জনপদে এমন অনেক স্বাধীনতা সংগ্রামী আছেন, যাঁদের এক-দুই শতাংশও তাম্রপত্রধারী বা পেনশন প্রাপক নন। ক্ষেত্রানুসন্ধানকারী ঐতিহাসিক নির্মলচন্দ্র চৌধুরী প্রমাণ সহযোগে তাঁদের কথা তুলে ধরার একটি প্রয়াস করেছিলেন। এর ফলে দেখা যাচ্ছে যে, এঁরা কেউ দ্বীপান্তরিত হয়েছিলেন। কেউ কেউ আবার একমাস, দুমাস, ছমাস বা দশ বছর পর্যন্ত জেল খেটেছিলেন। কেউ কেউ আবার কাটিয়েছিলেন অন্তরিত অবস্থায়, কেউবা নিহত হয়েছেন পুলিশের গুলিতে।[২] ১৯০৫ সালে এই ক্ষেত্রভূমিতে প্রথম ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন শ্রীনাথ হোড়, মাখনলাল ভৌমিক, কিশোরী মৌলিক, অক্ষয় মৌলিক, রমেশচন্দ্র চক্রবর্তী, চুনীলাল প্রামাণিক, মুন্সী সোনাউল্লাহ (তাঁর নামেই জলপাইগুড়ি শহরে গড়ে ওঠে 'সোনাউল্লাহ উচ্চ বিদ্যালয়'), প্রিয়নাথ গোস্বামী প্রমুখরা। জলপাইগুড়ির দিনবাজারে বিদেশী বস্ত্র সম্ভার পোড়ানোর অপরাধে দূর্গাদাস চক্রবর্তী, আদ্যনাথ মিশ্র, আনন্দ বিশ্বাস প্রমুখকে গ্রেপ্তার করা হয়। সত্তর বছর বয়স্ক দুর্গা চরণ সান্যালের হিলি স্টেশনে 'কোর্ট' ও 'মার্ট' নামক দুজন সাহেবকে হত্যা করার অপরাধে তিন বছরের জেল হয়। ১৯১০ সালের ২৪শে জানুয়ারীতে জলপাইগুড়ি জেলা স্কুলের ছাত্র বীরেন্দ্র দত্তগুপ্ত কলকাতা হাইকোর্টের ভিতরে পুলিশের ডি. আই. জি. সামসুল আলমকে গুলি করে হত্যা করলে বিচারে তাঁর ফাঁসি হয়।[৩]

বর্তমান জলপাইগুড়ি জেলার প্রান্তবর্তী অঞ্চলের স্বাধীনতা আন্দোলন বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। বরং 'বাংলার তমলুক বা বালুরঘাটের স্বাধীনতা আন্দোলনের থেকে কোন অংশে কম নয়।' ১৯২০ সালে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল সহ আলিপুরদুয়ারেও স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হয়ে গিয়েছিল। জেলা কংগ্রেসকে জনমুখী করতে এবং জালিয়ানওয়ালাবাগের বর্বর হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ১৯২০ সালের নভেম্বর মাসে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ জলপাইগুড়িতে এসেছিলেন। এরপরই জেলার বিভিন্ন জায়গায় অসহযোগ আন্দোলনের জোয়ার শুরু হয়ে যায়। সেই সময় বিখ্যাত বিপ্লবী সতীন্দ্রনাথ সেনকে (পরবর্তীতে বরিশাল জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক হয়েছিলেন) কুমারগ্রাম থানায় নজরবন্দি করে রাখা হয়। বিখ্যাত বক্সা ফোর্টেও অনেকে রাজবন্দী ছিলেন। এসকল খবর দ্রুত ছড়িয়ে পরবার সাথে সাথেই কুমারগ্রামে অসহযোগ আন্দোলন গণ আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। সে সময় আলিপুরদুয়ারে চলছিল কোর্ট বয়কট, বিলিতি কাপড় বর্জন এবং খাজনা বয়কটের আন্দোলন। 'শোন শোন কংগ্রেসি ভাই, ইংরেজ সরকারের খাজনা নাই' – এই শ্লোগানে গ্রামের হাট-বাজার মুখরিত হতে শুরু করে। যার ফলে ভাটিবাড়ি ও কুমারগ্রামে ইংরেজ সরকারের খাজনা আদায় প্রায় বন্ধই হয়ে গিয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ সরকারের জোর-জুলুম শুরু হয়ে যায়। এই সময় অসহযোগ আন্দোলনকে শক্তিশালী করবার জন্য ১৯২১ সালে কুমারগ্রামে কংগ্রেস শাখা কমিটি গঠন করা হয়েছিল। কুলকুলি হাটকে কেন্দ্র করে কুমারগ্রামের আন্দোলন ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছিল। কিন্তু ব্রিটিশরা বহু চেষ্টা করেও কুলকুলি হাটকে বয়কট অবস্থা থেকে ফিরিয়ে আনতে পারেনি। ১৯২৬-২৭ সালে আলিপুরদুয়ার মহকুমা কংগ্রেসের দায়িত্বপ্রাপ্ত নলিনী পাকড়াশির নেতৃত্বে সাইমন কমিশন বর্জন আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে স্থানীয় নেতৃবৃন্দের কাছে পরামর্শ আসে জয়প্রকাশ নারায়ণ, রামমনোহর লোহিয়া, অচ্যুত পটবর্ধন, অরুণা আসফ আলীর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখার জন্য। ১৯৪২ সালে তখন গান্ধীজির 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' –এর ডাকে কুমারগ্রাম উত্তাল হয়ে উঠেছিল।

জালিয়ানওয়ালাবাগের বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী জনমত গড়ে ওঠে জলপাইগুড়িতে। খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত সর্বক্ষণের জন্য কংগ্রেস কর্মীরূপে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তরুণকর্মী যোগেশ দত্ত, সুরেন মৈত্র অসহযোগ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। গ্রামে গঞ্জে প্রচারের কাজে এগিয়ে এলেন সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, সুরেশ মৈত্র প্রমুখরা। ফালাকাটায় সরকারী ক্যাম্পিং গ্রাউন্ডে পুলিশের বাধা দান সত্ত্বেও দশ হাজার মানুষ সেদিন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে সামিল হয়েছিল।[৪] বিদেশী বস্ত্র পোড়ানো হয়েছিল। জলপাইগুড়ি জেলার কুমারগ্রাম ব্লকের চা বাগানের হাট বয়কট আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মঘা দেওয়ানী। ইংরেজদের নিয়ন্ত্রিত হাটকে বয়কট করে পাল্টা হাট স্থাপন করে ইংরেজ সরকারকে চরম অপদস্থ করেছিলেন এই মঘা দেওয়ানী। নতুন হাটে সভা করে মঘা দেওয়ানীরা ঘোষণা করলেন খাজনা বয়কটের ও বিলিতি কাপড়-চোপড় বর্জনের। স্লোগানে মুখরিত হল নতুন হাট –

'ভাত দিম, পানি দিম, খাজনা দিম না।
জান দিম, পান দিম, ট্যাকসো দিম না।
ইংরেজকে খাজনা দিম না।
বিলিতি কাপড়া পরমুনা,
হাট বন্ধ কুলকুলি,
বন্দেমাতরম হক বুলি।'[৫]

রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ এনে মঘা দেওয়ানী ও তাঁর সহযোগী পশুপতি সিং কুণ্ডোরকে গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু ডুয়ার্সের প্রত্যন্ত এলাকা থেকে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন ও জনতার চাপে মঘা দেওয়ানীকে ইংরেজরা মুক্তি দিতে বাধ্য হয় (১৯২১ সালের ঘটনা)। নলিনী পাকড়াশি আলিপুরদুয়ার মহকুমার বিস্তীর্ণ এলাকা ঘুরে ঘুরে

ব্রিটিশ বিরোধী অসহযোগ আন্দোলন জোরদার করেছিলেন। ১৯২০-২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের সময় শুধু বাঙালী নয়, গোর্খাদের মধ্যেও জেগে উঠেছিল দেশ প্রেমের প্রেরণা। তাঁদের পুরোভাগে ছিলেন দলবাহাদুর গিরি, কার্সিয়াং-এর হেলেন লেপচা এবং কালিম্পং-এর জঙ্গবীর সাপকো।

স্বাধীনতা আন্দোলনে উত্তরবঙ্গে যে আলোড়নের শুরু হয়েছিল, সেখানে পুরুষদের পাশাপাশি মহিলারাও সমানভাবে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এমনই একজন মহীয়সী নারী ছিলেন উপরোল্লিখিত কার্শিয়াং-এর অগ্নিকন্যা হেলেন লেপচা।[৬] পাহাড়বাসীর কাছে যিনি পরিচিত ছিলেন 'সাইলি দিদি' নামে। তবে মহাত্মা গান্ধী তাঁর নতুন নামকরণ করেছিলেন 'সাবিত্রী দেবী'। ব্রিটিশ সরকার ভারতের জাতীয় আন্দোলন থেকে নেপালী ও গোর্খাদেরকে দূরে রাখার জন্য সর্বতভাবে চেষ্টা করলেও দার্জিলিং জেলার দলবাহাদুর গিরীর নেতৃত্বে পাহাড়ের মানুষজনদের ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ থেকে বিরত রাখা সম্ভব হয়নি। এই দলবাহাদুরের নেতৃত্বে পাহাড়ের মেয়েরাও জাতীয় আন্দোলনে ভাগ নিয়েছিল। আর হেলেন লেপচা ছিলেন সেই সকল মহিলাদের পথিকৃৎ। জানা যায়, সরোজিনী নাইডুর সাথে তিনি আহমেদাবাদ কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, হেলেন লেপচার সাথে তৎকালীন কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মিত্রতার সম্পর্ক ছিল। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ঢেউ যখন সারা ভারতে আছড়ে পরেছিল, সেই সময় সাবিত্রী দেবী তথা হেলেন লেপচা তাঁর কিছু স্বয়ংসেবকদের সাথে শিলিগুড়ি শহরের বিভিন্ন ঘরে ঘরে এবং দোকানে দোকানে ঘুরে ঘুরে বিদেশী দ্রব্য বর্জন এবং স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের জন্য অনুপ্রাণিত করতে থাকেন। তাঁর এই ডাকে সারা দিয়ে শিলিগুড়ি শহরের বিভিন স্থানে বিদেশী দ্রব্য পোড়ানো হয়। ১৯২২ সালের ৩১শে জানুয়ারী অমৃতবাজার পত্রিকায় লেখা হয়, "Smt. Savitri Devi with the Congress Secretary and E. Ahmed and 12 Gorkha Volunteers have been arrested."[৭] হেলেন লেপচা দার্জিলিং জেলার জেলে তিনমাস বন্দি ছিলেন। জেল থেকে ছাড়া পাবার পরও তাঁর কার্সিয়াং-এর বাড়িতে তাঁকে নজরবন্দি করে রাখা হয়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ অসুস্থ থাকাকালীন দার্জিলিং-এ এলে হেলেন লেপচা ওরফে সাবিত্রী দেবী তাঁর সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন। এমনকি জানা যায় যে, ১৯৩৯-৪০ সালে নেতাজী সুভাসচন্দ্র বসুকে কার্সিয়াং-এর গিদাং পাহাড়ে নজরবন্দি করে রাখা হলে সাবিত্রী দেবী সেই সময় প্রতিদিন পাউরুটির মধ্যে কাগজের টুকরোতে নেতাজীকে গোপন তথ্য সরবরাহ করতেন। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁকে 'Tribal Headman of the District' সম্মানে ভূষিত করে।[৮] ১৯৭২ সালের ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতার রৌপ্য জয়ন্তী বছরে ভারত সরকার হেলেন লেপচাকে 'তাম্রপত্র' প্রদান করে। তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর হাত থেকে তিনি এই সম্মান গ্রহণ করেছিলেন। অতঃপর ১৯৮০ সালের ১৮ই আগস্ট হেলেন লেপচা পরলোক গমন করেন।

জাতীয়তাবাদী আদর্শ ও কংগ্রেসের বাণী প্রচার করে ভল্কা পরগণা তথা আলিপুরদুয়ারের বিস্তীর্ণ অংশের অধিবাসীদের সকলকে স্বাধীনতার আন্দোলনের সহযোগী রূপে গড়ে তোলায় এই অঞ্চলের জনগণ দলবাহাদুর গিরিকে 'নলিনী ঠাকুর', 'তারকাটা ঠাকুর', 'ভুটান গান্ধী' প্রভৃতি নামে সম্বোধন করতে থাকে। ১৯২২ সালে যতীন রায়, মাখনলাল ভৌমিক প্রমুখ স্বেচ্ছাসেবক ভুটানের সীমান্ত থেকে বোদা, পূর্ণিয়া পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সংগঠন বৃদ্ধির লক্ষ্যে অভিযানে নেমে পড়েছিলেন। ১৯২৪ সালে জাতীয়তাবাদী নেতা খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তকে ব্রিটিশ বিরোধী ষড়যন্ত্রের অভিযোগে জলপাইগুড়ি জেলের একটি নির্জন সেলে বন্দী করে মুর্শিদাবাদ জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ১৯২৭ সালে জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বে আসেন অন্নদাচরণ সেন। তাঁর নেতৃত্বে পালন করা হয় জাতীয় সপ্তাহ। তারাপদ সান্যাল, শ্রীনাথ হোড় এই প্রচারকার্যে সহযোগিতা করেছিলেন।[৯]

গান্ধীজি ১৯২৫ সালের ৯ই জুন জলপাইগুড়িতে এলে স্থানীয় জনমানসে এক গভীর পড়ে। ১৯২৫ সালে মহাত্মা গান্ধীজি দার্জিলিং থেকে ফেরার পথে জলপাইগুড়ির টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ভবনের ময়দানে জনসভায় বক্তৃতার মাধ্যমে অসহযোগ আন্দোনলের তাৎপর্য বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। এরপর থেকেই দেখা যায়, গান্ধী টুপি মাথায় দিয়ে রাজবংশী বালক

ও যুবকগণ গাইছে—

'গান্ধী রাজা আইল দ্যাশে,
লড়াই করে শিয়াল দাশ।
পড়িও না র‍্যাশমী চুড়ি,
আর বিলাইতি শাড়ি,
হারেরে হারেরে-হারেরে।'[১০]

এখানে শিয়াল দাশ বলতে সি. আর. দাশের কথা বলা হয়েছে। যাইহোক, এরপর ১৯৩০ সালে গান্ধীজির আইন অমান্য আন্দোলনের ঢেউ এসে পড়ে জলপাইগুড়িতে। জে. এম. ওয়াই. -এর মাঠে বিশাল সভায় রায়কত বংশের রাজা জগদিন্দ্রদেব রায়কত রাজকীয় বৈভব ত্যাগ করে, খদ্দরের ফতুয়া পরে, কাঠের খড়ম পায়ে দিয়ে , হাতে তালপাখা নিয়ে সভায় যোগদান করেছিলেন। পিকেটিং করার অপরাধে বেশ কয়েকজন আদিবাসী যুবক ও রাজবংশী মানুষ গ্রেপ্তার বরণ করেছিলেন। পঞ্চগড়, বোদা, রাজগঞ্জ হাট, ধুপগুড়ি হাট অঞ্চলের বহু মানুষ পিকেটিং-এ সামিল হন। পাথরঝোড়া চা বাগানের শ্রমিক গুর্জা মুণ্ডা কোদালের ঘায়ে বাগানের সাহেব কর্মচারী বিটনকে হত্যার বিচারে তাঁর ফাঁসি হয়। পাটগ্রামের বাঁশকাটা মেলায় জাতীয়তাবাদী মিছিলের ওপর পুলিশ গুলি চালায়। ইমার্জেন্সি অর্ডিন্যান্স অমান্য করায় উপেন্দ্রনাথ রায় সহ বহু রাজবংশী মানুষ গ্রেপ্তার হন।

১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে জলপাইগুড়ি সেইসময় উত্তাল। বিজয়া দশমীর রাতে করলা নদীর বিসর্জন ঘাট শ্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে। পোস্টারে লেখা হয়েছিল – "ইংরেজদের আইন মানি না', 'বিলিতি জিনিস বয়কট করো', 'অস্পৃশ্যতা দূর কর', 'মাদক দ্রব্য বর্জন কর' ইত্যাদি।[১১] সেদিন রাজদ্রোহের অপরাধে গ্রেপ্তার হন বীরেন দত্ত, চারুচন্দ্র সান্যাল, শশধর কর প্রমুখরা। সেবছর কারাবরণ করেছিলেন ভবরঞ্জন গাঙ্গুলি, ভবাণী চক্রবর্তী, নৃপেন মৌলিক সহ আরও অনেক স্বাধীনতা সংগ্রামীরা। ১৯৩০ সালে রামশাই হাটে পিকেটিং করার অপরাধে গ্রেপ্তার হন শ্রীরাম ওঁরাও গঙ্গ। পরের হাটে একই অপরাধে গ্রেপ্তার হন সোমা ভগৎ ও গাঠারু ভগৎ। জুলাই মাসে পচাগড়ে আইন অমান্য করতে গিয়ে বন্দি হন ভগী দাস, বিখানি দাস, একাও দাস, খুটিয়া দাস, গেদাঙ দাস, সত্যরাম দাস, বসন্ত দাস, ঢেকু দাস, সমারু দাস, আসারু দাস, আতিয়া দাস, মানুয়া দাস, বৈঠা দাস, ডাকুয়া দাস প্রমুখরা। ঐ বছর আগস্ট মাসে ধুপগুড়ি হাটে প্রচণ্ড গণআন্দোলনে চারজন আদিবাসী যুবক এবং পচাগড় হাট থেকে কারাবাসা বর্মণ, ধৈর্যনারায়ণ বর্মণ, পানীয়া বর্মণকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার বরণ করেন ভোলাকান্ত দাস, অন্তেশ্বর দাস, বাহার দাস। এরা সকলেই ছিলেন বোদার বাসিন্দা। মাখনলাল ভৌমিক এক সভায় জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়ে বলেছিলেন, 'লবণ আইন ভাঙা আমাদের জন্মগত অধিকার'।[১২] শুধু আন্দোলনে যোগদান এবং কারাগারে গিয়েই রাজবংশীগণ কর্তব্য শেষ করেন নি। আন্দোলন পরিচালনার জন্য আর্থিক সাহায্যও করেছিলেন। ১৯৩১ সালের ২৯শে নভেম্বরের 'ত্রিস্রোতা' পত্রিকায় দেখা যায়, কংগ্রেস কমিটির সাহায্যার্থে প্রায় ৮৩ তোলা রূপার গহনা দান করেছিলেন শ্রীরামমোহন রায়। শ্রীঅমর সিংহ রায় দান করেছিলেন প্রায় ২৫ তোলা রূপার সূর্যমোহিনী হার। কিন্তু দুঃখের বিষয় স্বাধীনতা সংগ্রামে রাজবংশীদের এই সকল দানের কথা সেভাবে কেউ জানে না। ১৯৩২ সালে ময়নাগুড়িতে গ্রেপ্তার হন কমলাকান্ত দাস ও বাজারু দাস। তাঁদের তিন মাসের কারাদণ্ড হয়েছিল। ১৯৩২ সালের ১৯শে মার্চ আদালতে জাতীয় পতাকা তোলা ও বন্দেমাতরম ধ্বনি দেবার অপরাধে দ্বারিকানাথ দে, কামিনী মোহন রায় ও কণ্ঠনারায়ণ রায়কে গ্রেপ্তার করা হয় ও তাঁদের ৬ মাসের কারাদণ্ড হয়। ১৯৩৪ সালের ৩১শে মে গান্ধীজি দ্বিতীয়বার জলপাইগুড়িতে এলে জাতীয়তাবাদী নেতা সুরেশ চন্দ্র পাল মহাত্মাজীকে সম্বর্ধনা প্রদানের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। সে প্রস্তাব সমর্থন করেছিলেন জলপাইগুড়ির পুরসভার অপর একজন জাতীয়তাবাদী পুরসদস্য ডা. যোগেশ চন্দ্র ঘোষ। সেই প্রস্তাব নিয়ে ইংরেজ সংখ্যা গরিষ্ঠ পুরসভায় এক বিরুপ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল।[১৩] ক্ষত্রিয় সমিতির জগদিন্দ্র দেব

রায়কত, মধুসূধন রায় জলপাইগুড়িতে কংগ্রেসের শক্ত ভিত গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন। ১৯৩৯ সালে জলপাইগুড়িতে যে প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সে সম্মেলন স্থানের নাম রখা হয়েছিল 'জগদিন্দ্র নগর'। এই সময় গ্রামীণ মানুষ, রাজবংশী, আদিবাসী থেকে শুরু করে বর্ণহিন্দু, মুসলমান সমাজ, এমনকি মাড়োয়ারী সমাজও জাতীয় কংগ্রেসের পতাকাতলে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে এগিয়ে এসেছিলেন। ১৯৪১ সালে সত্যাগ্রহী আন্দোলনে জলপাইগুড়িতে গ্রেপ্তার হন চারুচন্দ্র সান্যাল, রবীন্দ্রনাথ সিকদার, সতীশ চন্দ্র লাহিড়ী সহ বহু কর্মী।

১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে ভাদ্রু সিং এবং পাথর সিং অংশগ্রহণ করে কারাবরণ করেন। এছাড়া মাল্লাগুড়ির চৈতন্য সন্ন্যাসী ও তাঁর স্ত্রী শ্রীমতি আবুশ্বরী সন্ন্যাসী এই আন্দোলনে গ্রেপ্তার হন। শিলিগুড়িতে এই আন্দোলন গুরুতর আকার ধারণ করেছিল। দিলীপ কুমার রায় সরকার, উপেন্দর নাথ দাস, দ্বীপেন্দ্র নাথ রায় সরকার প্রমুখ রাজবংশী ছাত্রের নেতৃত্বে 'ইংরেজ ভারত ছাড়ো', 'ইউনিয়ন জ্যাক নিপাত যাক', প্রভৃতি ধ্বনি দিতে দিতে শোভাযাত্রায় সামিল হন।[১৪] ১৯৪২ সালের আন্দোলন আলিপুরদুয়ার মহকুমার মধ্যে কুমারগ্রামেই সবচাইতে তীব্র আকার ধারণ করেছিল। আন্দোলনকারীদের মধ্যে ছিলেন সুনীল সরকার, দেবেন দাস, দেওয়ান রায়, গোপাল রায়, সুবিত রায়, রমানাথ ঠাকুর, কালীপ্রসন্ন দাস প্রমুখরা। ১৯৪২ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর আলিপুরদুয়ার মহকুমার সব থানা দখলের পরিকল্পনা সফল না হলেও কুমারগ্রাম থানা আন্দোলনকারী দখল করতে সক্ষম হয়। কুমারগ্রামের আন্দোলনকারীদের এই সফলতা জলপাইগুড়ি জেলার বিপ্লবীদের উৎসাহিত করেছিল। স্বাধীনতা লাভের পর দু-একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী ভাতা পেলেও বাকিরা খোঁজ নেন নি এবং ভাতাও পান নি।[১৫] স্বাধীনতা লাভের পূর্ব মুহূর্তে ডুয়ার্সের চা বাগানে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে যারা শহীদ হয়েছিলেন তারা হলেন – মহারাণী ওঁরাও, শুখু ওঁরাও, মুধু ওঁরাও, বাছু ওঁরাও প্রমুখ।[১৬]

এরকম বহু ব্যক্তি গ্রামে-গঞ্জে লোক চক্ষুর আড়ালে রয়ে গিয়েছেন, যাঁদের কথা সংবাদপত্রে, পুলিশের খাতায়, কোথাও উঠে আসেনি। অথচ সমাজ তাঁদের কথা কিছু দিন উজ্জ্বলভাবে মনে রেখেছিল। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের ৭৩টি বছর অতিক্রান্ত হতে না হতেই তাঁরা ডুবে গিয়েছেন কালের অতলে। এভাবেই মানুষের জ্ঞানের অন্তরালে রয়ে গিয়েছেন বহু নিম্নবর্গীয় মানুষ, যাঁদের অবদানের কথা দেশ বা সমাজ মনে রাখার প্রয়োজন বোধ করেনি। তাই এবিষয়ে দেরিতে হলেও অনুসন্ধান শুরু করা জরুরী। সত্য-মিথ্যা, শ্রুতি গল্পকাহিনীও প্রকাশ্যে চর্চা করে সারটুকু গ্রহণে এগিয়ে আসা উচিৎ। স্বাধীনতা সংগ্রামী রমাকান্ত রায়ের ছেলে সুকুমার রায় বলেছেন, "জেহেল খাটিলেও হামার বাপ সরকারী পেনশন-টেনসন নিবার জন্য দরখাস্ত করেন নাই। জেহেল খাটা ছাট্টিফিকেট কাগজপত্র বাড়ি আসিবার সময় গঙ্গার জলত ভাসায়া দিয়া আইসচে। কহিচে, দ্যাসের জইন্যা খাটিছি, পাইসার তানে কি?"[১৭] ডুয়ার্সের ধূপগুড়ি, মাগুরমারি, ফালাকাটা, কালচিনি, আলিপুরদুয়ারকে কেন্দ্র করে বীরেন্দ্র দত্তের নেতৃত্বে রাজবংশী ও আদিবাসী জনগণ সভা, বিলাতি দ্রব্য বর্জন, মাদকদ্রব বর্জন ও বিদেশী ইংরেজ শাসনকে পঙ্গু করে দেবার জন্য ব্রতী হন। পল্লী-গ্রামের রাজবংশী মেয়েদের মুখে শোনা যেতে লাগল বহুশ্রুত গান—

'মহাত্মা গান্ধিজী,
হামরা খদ্দর ধৈরাছী।
বিলাইতি নুন আর খামনা
দেশী ধৈরাছী।'[১৮]

কিশোরী বর্মণের নেতৃত্বে জলপাইগুড়ি জেলা এবং রংপুর জেলার রাজবংশী কৃষকেরা উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিলেন। এমনই আরও কয়েকজন রমণী হলেন উজানী বর্মণ, বুড়ি বর্মণ, লীলা সেন (নকশাল নেতা চারু মজুমদারের স্ত্রী)। সেই সময় কৃষক আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এসেছিলেন রাজবংশী সমাজের পুর্ণেশ্বরী বর্মণ – সকলের 'বুড়িমা'।

এভাবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার জনগণ দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়েছিলেন,

কখনো পুলিশের মুখোমুখি হয়ে সংগ্রাম করেছেন, কখনোবা জেলে গিয়েছিলেন দেশ মায়ের জন্য। বন্দুকের গুলিতে আহত হয়েছিলেন এবং মৃত্যু বরণও করেছিলেন অনেকে। সে ইতিহাস পরম গৌরবের।

সূত্র নির্দেশ:

১. শর্মা, উমেশ, (২০১৪), *ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে জলপাইগুড়ি,* উত্তরবঙ্গ লোকসংস্কৃতি সমিতি, জলপাইগুড়ি, পৃ. ৪০।

২. চৌধুরী, নির্মলচন্দ্র, (১৯৮৫), *স্বাধীনতা সংগ্রামে রাজবংশী সম্প্রদায়,* উত্তরবঙ্গ অনুসন্ধান সমিতি, জলপাইগুড়ি, পৃ. ১২-১৩।

৩. *তদেব,* পৃ. ১৬।

৪. *তদেব,* পৃ. ১৭।

৫. *তদেব,* পৃ. ১৯।

৬. সাক্ষাৎকার: রত্না রায় সান্যাল (অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপিকা, ইতিহাস বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়), ০২/০৬/২০১৮।

৭. *তদেব।*

৮. *তদেব।*

৯. শর্মা, উমেশ, (২০১৪), *পূর্বোক্ত,* পৃ. ৫২।

১০. চৌধুরী, নির্মলচন্দ্র, (১৯৮৩), *স্বাধীনতা সংগ্রামে উত্তরবঙ্গের আদিবাসী,* উত্তরবঙ্গ ইতিহাস পরিষদ, জলপাইগুড়ি, পৃ. ১০-১১।

১১. *কিরাত ভূমি, জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা,* (১৯৯৫), বইওয়ালা, পৃ. ৫৫৬-৫৬০।

১২. চৌধুরী, নির্মলচন্দ্র, (১৯৮৫), *পূর্বোক্ত,* পৃ. ২০।

১৩. শর্মা, উমেশ, (১৯৯৭), *জলপাইগুড়ির রায়বাহাদুর-খানবাহাদুর,* কাঞ্চনজঙ্ঘা পাবলিকেশন, শিলিগুড়ি, পৃ. ৩১।

১৪. শর্মা, উমেশ, (২০১৪), *পূর্বোক্ত,* পৃ. ৪৩।

১৫. রায়, জ্যোতির্ময়, (২০১০), *ভল্লা পরগনার ইতিবৃত্ত,* প্রভা প্রকাশনী, পৃ. ৫১।

১৬. চৌধুরী, নির্মলচন্দ্র, (১৯৮৩), *পূর্বোক্ত,* পৃ. ২১।

১৭. চৌধুরী, নির্মলচন্দ্র, (১৯৮৫), *পূর্বোক্ত,* পৃ. ১২।

১৮. চৌধুরী, নির্মলচন্দ্র, (১৯৮৩), *পূর্বোক্ত,* পৃ. ১৪।